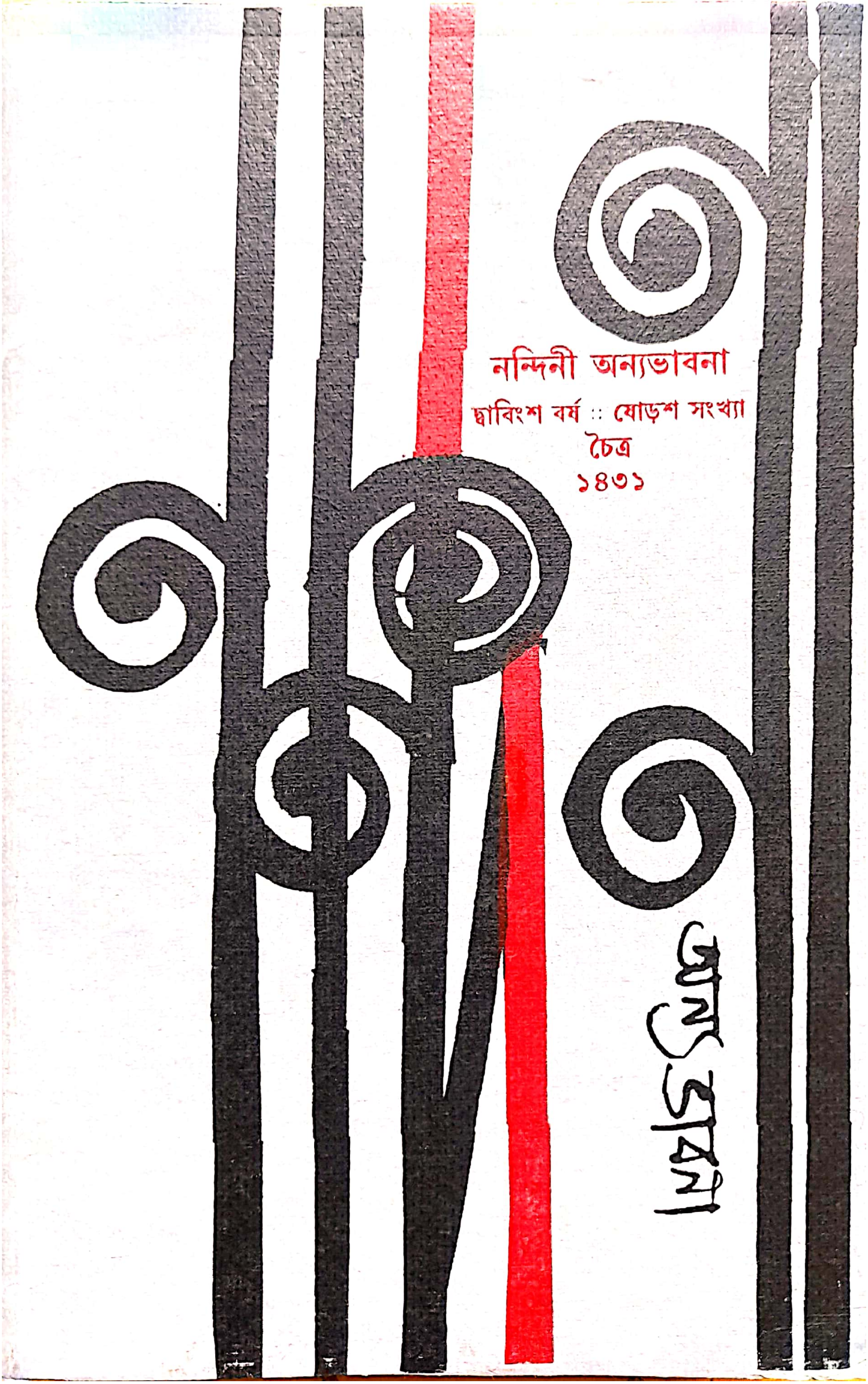
নন্দিনী অন্যভাবনা

দ্বাবিংশ বর্ষ :: ষোড়শ সংখ্যা

চৈত্র

১৪৩১



: সাহিত্য ও মনন বিষয়ক পত্রিকা :

দ্বাবিংশ বর্ষ ॥ ষোড়শ সংখ্যা : চৈত্র ১৪৩১ ॥ সূচিপত্র

❑ শ্রদ্ধাঞ্জলি : মানসকুমার চিনি

❑ স্মরণ : পিটার হিগ্‌স

❑ প্রবন্ধ- ১

❑ কবিতা :

: প্রচ্ছদ :

প্রণবেশ মাইতি

: নামলিপি:

হিরণ মিত্র

: ঋণ স্বীকার :

প্রবেশক রঙিন চিত্রটি NGMA কর্তৃক প্রকাশিত গুলাম মহম্মদ শেখ এবং আর.শিবকুমার কর্তৃকসম্পাদিত *BENODBEHARI MUKHERJEE (1904 - 1980): CENTENARY RETROSPECTIVE* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

প্যালেস্তাইন যুদ্ধ, জর্ডান (১৯৭০) চিত্রটি ROSA MARIA FALVO সম্পাদিত *ZAINUL ABEDIN* গ্রন্থ (বেঙ্গল ফাউণ্ডেশন, ২০১২) থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদক

বিক্রমজিৎ মণ্ডল

প্রথম যুগের শান্তিনিকেতনে জাতিভেদ ও সংস্কার-সমিতি

শুভ্রনীল দত্ত

১

রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে "ব্রহ্মচর্যাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করলেন তখন সেখানে প্রধান দায়িত্বে আনলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-কে। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে তাঁর শিষ্য রেবাচাঁদ-ও এসেছিলেন। এঁরা দুজনেই খুব অল্পদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন (ডিসেম্বর, ১৯০১- জুন, ১৯০২)। কিন্তু যখন ছিলেন সেটা একেবারে আরম্ভে। রেবাচাঁদ পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর যে জীবনী লিখেছেন তাতে সেই সময়ের খুব সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[1]তা থেকে জানা যায় খাবার ঘরে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসে খেত। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই এটার প্রচলন ছিল। দ্বিতীয়ত, ভোর পাঁচটার আগেই উঠে ঘর ঝাঁট দিয়ে পুকুরে (ভুবনডাঙ্গার বাঁধ ?) সাঁতার কেটে স্নান ক'রে ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা সাদা সিল্ক, বৈদ্য ও কায়স্থ ছাত্ররা লাল সিল্ক এবং বৈশ্য ছাত্রেরা হলুদ রঙের সিল্ক-এর কাপড় পরে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গাছের তলায় বসে সংস্কৃতে তাদের উপাসনা করত।

জাতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা কাপড় পরা কতদিন চলেছিল জানা নেই। তবে মনে হয় বেশি দিন নয় কারণ রেবাচাঁদ ছাড়া আর কারো লেখায় এই কথার উল্লেখ এখনো দেখতে পাইনি। তাছাড়া এই ব্যাপারটি ব্রহ্মবান্ধব এবং রেবাচাঁদ-এরই পরিকল্পনা— এমনও হ'তে পারে। কারণ নিজেকে "হিন্দু ক্যাথলিক" বললেও, এবং ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রচারে যেভাবে গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রবেশ ফলপ্রসূ হয়েছিল সেইরকমভাবেই ভারতে বেদান্তের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের প্রচার অধিক সফল হবে[2] এরকম কথা বললেও— ব্রহ্মবান্ধব ক্রমশ হিন্দু সমাজের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, বর্ণাশ্রম ইত্যাদির পুনরুদ্ধারের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিলেন এবং আকর্ষিত হচ্ছিলেন। জাতি অনুযায়ী আলাদা কাপড়ের কথার আর কোথাও উল্লেখ না পেলেও ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা আলাদা পঙ্‌ক্তি-তে বসে খেত এবং এই প্রথা বহুদিন চলেছে তার উল্লেখ বহু জায়গাতেই পাওয়া যায়।

বয়স্ক মানুষদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যায়, ব্রাহ্মণ-দের আলাদা পঙ্‌ক্তি-তে খাওয়ার ব্যবস্থা তখন সমাজের রীতি ছিল। মনে হয় সেটারই ধারাবাহিকতায় শান্তিনিকেতনে এই বন্দোবস্ত ছিল (তাছাড়া প্রথমদিকে প্রাচীন ভারতের আদর্শ ইত্যাদির প্রভাবও থাকতে পারে)। সমাজে ছিল এবং সেটারই ধারাবাহিকতায় শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পংক্তি-তে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল একথা বলছি তার আরেকটি কারণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষ-কে ২৭ কার্তিক, ১৩০৯ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১২ নভেম্বর, ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি। এই চিঠিটিকেই 'রবীন্দ্রজীবনী'কার "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম কন্সটিটিউশন" বলেছেন। চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন– "যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনো প্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু-আচারবিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না... ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।"[3]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সমাজে যে হিন্দু আচার আছে সেই বিষয়ে কোন সমস্যা তৈরি না করাই তাঁর উদ্দেশ্য, সেগুলির ধারাবাহিকতা শান্তিনিকেতনে বজায় রাখারই- মনোভাব এবং সেই সকল আচার-কে নিয়ে ঔচিত্য বা প্রশ্নমূলক কোন ভাবনা তখন অনুপস্থিত। অন্তত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুপস্থিত।

সুতরাং খাওয়ার ব্যাপারে জাতিভেদ এবং আচার বিচার তাহলে ছিল। প্রশ্ন ওঠে তা কতদূর ছিল ? এবিষয়ে একটি আন্দাজ পাওয়া যায় "বঙ্গীয় শব্দকোষ" প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি প্রবন্ধে। "রবীন্দ্রপ্রসঙ্গের পরিশিষ্ট" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি লিখছেন– "আশ্রম প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ভূপেন-দার ম্যানেজারীর সময়ে সকালে বিকালে রাত্রিতে বালকদিগের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত হইয়া পর্যবেক্ষণের ভার কিছুকাল আমার উপরে ছিল। কোনো কারণে মধ্যাহ্নে বালকদিগের আসার পূর্বে আমার আসা সম্ভব হইত না, সেই সময়ে আমার এক অধ্যাপকবন্ধু আমার পরিবর্তে আসিয়া খাওয়ার প্রথম ব্যবস্থা করিতেন, আমি কিছু পরেই যোগ দিতে আসিতাম। এই সময়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুইশত। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের খাওয়ার পরে আমরা খাইতাম। একদিন সকলের খাওয়ার পরে শুনিলাম, একটি অস্পৃশ্য জাতির বালকের কোন প্রকার সংস্পর্শে অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন দূষিত হইয়াছে। ঠাকুর চাকরেরা আপত্তি করিয়া বলিল, আমাদের কি ব্যবস্থা হইবে? আমি বলিলাম, কর্তৃপক্ষকে জানাও, তাহারা ব্যবস্থা করিবেন। আমরা দুগ্ধাদি খাইয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া স্বস্থানে আসিলাম। কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন স্মরণ হয় না।"[4]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথার অবতারণা করেছেন "অপরাধীর প্রতি কবির ব্যবহার" প্রসঙ্গে। কারণ এই ঘটনার পরে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির খাজাঞ্চি তাঁর বড়দাদা

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর থেকে জানতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে জোড়াসাঁকোয় অভিযোগ শোনা যায় যে, তিনি নাকি বিদ্যালয়ের অনেক ভাত নষ্ট করেছেন। দাদাকে সম্পূর্ণ ঘটনা বললে দাদা তাঁকে এই নিয়ে চিন্তিত হতে বারণ করেন, কারণ তিনি জানান যে, রবীন্দ্রনাথের এই সকল কথা খুব বেশি মনে থাকে না, ভুলেই যান। কিন্তু কিছুদিন পরে রান্নাঘর সংক্রান্ত কোন কাজেই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে শেষে হরিচরণ নিজেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি "বিদ্যালয়ের ভাত নষ্ট করার কথা" শুনেছেন কিনা। রবীন্দ্রনাথ তখন বলেন যে তিনি শুনেছেন হরিচরণ নাকি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ জনের ভাত নষ্ট করেছেন। এ'কথা শোনার পর সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত ক'রে হরিচরণ জানান সেদিন দু-তিনজন শিক্ষক আর চাকর বাদে বাকি সকলেরই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই এতজনের ভাত নষ্ট সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ বিষয়টি জেনে রবীন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হন এবং বলেন, এই কারণে তিনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এখন বিষয়টি তাঁর কাছে পরিষ্কার হ'ল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই বয়ান থেকে অতএব এ'কথাই স্পষ্ট হয় যে খাওয়ার ব্যাপারে রান্নাঘরে জাতপাত বা আচার বিচার সমাজের অধিকাংশ জায়গার মতন শান্তিনিকেতনেও অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল এবং এ নিয়ে প্রশ্নসূচক কিছু উপস্থিত ছিল না। প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথ-ও কি তাহলে এই নিয়ম সমর্থন করতেন? বা তিনি যদি রান্নাঘরে খেতেন তাহলে তিনি কোথায় বসে খেতেন? এবিষয়েও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন — "ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও, রবীন্দ্রনাথের হিন্দু ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহার বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্র প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন।... তিনি হিন্দু মতানুসারে আশ্রমের পাকশালায় পাচকব্রাহ্মণ, নবশাক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সহভোজন তাঁহার অনভিমত না হইলেও, তিনি পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাহাকে প্রাধান্য দেন নাই। সকলেই যথারুচি ভোজন করিতে পারিবেন, ইহা তাঁহার সর্ববাদিসম্মত মত ছিল। কোন কোন অভিভাবক একবার আমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি কবির এই যথারুচি ভোজনের মত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম।"[5]

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরে শিক্ষক– ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ধী.মু.) তাঁর "আশ্রমস্মৃতি" বইতে লিখেছেন– "কখনও কখনও গুরুদেবের কাছ থেকে ভর্ৎসনাও পেয়েছি। আহারের ঘরে একবার কিছুদিন গুরুদেব সকলের সঙ্গে খেতেন। রন্ধনশালার কাছেই একটা উঁচু চাতালের উপর আমরা কয়েকটি ব্রাহ্মণ ছাত্র পৃথক বসতাম। আমাদের সঙ্গে দুই-একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মাস্টারমশাইও বসতেন। একটু নীচে লম্বা আহারের ঘরে জাতি নির্বিশেষে অন্যান্য ছাত্র শিক্ষক বসতেন। তারই মধ্যে গুরুদেব বসতেন। আমরা জাত্যভিমানীরা দূর থেকে গুরুদেব কী খেতেন কোনোদিন দেখিনি, জানতেও চেষ্টা করিনি। আহারের সময় অনাবশ্যক কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। গুরুদেবের থেকে আমরা দূরে খেতে বসতাম, সুতরাং আমরা সে নিয়মটা তত পালন করতাম না। একদিন অন্য সময়ে যেই গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়েছি, অমনি তিনি একটু সরে গিয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণত্বের বড়াই

কর, অথচ ব্রাহ্মণের পালনীয় নিয়ম পালন কর না।' আমি তো স্তম্ভিত ও মর্মাহত।"[৬] অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পঙ্ক্তি ভোজনের কোন বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথ করেননি কিন্তু তিনি নিজে খাওয়ার ঘরে জাতি নির্বিশেষে অব্রাহ্মণদের সঙ্গে খেতেন।

প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথের নিজের যদি "সহভোজন"– এর অভিমত থাকে, তাহলে তিনি এই আলাদা বৈষম্যমূলক পঙ্ক্তিভোজনের বিরোধিতা করেননি কেন ? সম্ভবত এর তিনটি কারণ। একটি হ'ল– বাস্তবিক অসুবিধা। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল খুলেছেন, সেখানে ছাত্র প্রয়োজন। এদিকে যেসব ছাত্র আসবে তারা সমাজ থেকেই আসবে, যেখানে এই জাতিভেদ মানা হয়। ছাত্রদের অভিভাবকদের এই বিষয়ে চিন্তিত হওয়ার ইঙ্গিত, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপরের লেখা থেকে যায়। তাই সেখানে এই বিষয়টি মানা না হ'লে ছাত্র পেতে যে সমস্যা হবে এই আশঙ্কা মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় সে কথা জানা যায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষক "রবীন্দ্রজীবনী"কার প্রভাতকুমারের লেখাতেও। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা শিথিল হতে হতে উঠে গেলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান– "জাতির পাঁতি তুলিবার জন্য কয়েকজন অভিভাবক তাঁহাদের আশ্রিত কয়েকটি ছাত্রকে আশ্রম হইতে সরাইয়া লইয়া যায় বলিয়া জানা যায়।"[7]

আর একটি কারণ সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব, যাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো সেভাবে প্রশ্ন করেননি এবং স্বীকার করেছেন। আর ব্রাহ্ম হলেও দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের অনেক রীতি রেওয়াজেরই বিরোধিতা করেননি। "ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা তাঁহার [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের] চিরদিনের আদর্শ ছিল।[৮] এই কারণেও বহুলাংশে ব্রাহ্ম সমাজে ভাঙনের সূত্রপাত। তাছাড়াও এইসময়টি সংস্কার আন্দোলন পেরিয়ে, হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের সময়। বাংলার আকাশে তখন বিবেকানন্দ-ব্রহ্মবান্ধব-অরবিন্দ। তাই শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগেই এবং দেবেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে, তদুপরি সেই সময়ে, খাওয়ার ঘরের মত জায়গায় সামাজিক আচারের অপালন ক'রে অন্য ব্যবস্থা স্থাপন করার কথা রবীন্দ্রনাথ হয়তো স্বাভাবিকভাবেই ভাবেননি। এছাড়াও "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" বইতে তিনি জানাচ্ছেন– "আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করি তাহলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাদের আশঙ্কা।... এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবলভবেই ব্যাঘাত চলেছিল"।[৯] মনে রাখার কথা এই সময় রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়ে খ্যাতির শিখরে ওঠেননি, ক্ষমতার অধিকারীও তেমন কিছুই নন। তাই তাঁর সংকল্প– অর্থাৎ একটি ইস্কুল এবং সেখানে নিজের বোঝাপড়া মত পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান – এই মূল জিনিসটিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এরকম কাজ তিনি করবেন না এটাই হয়তো স্বাভাবিক। তৃতীয় কারণটি হ'ল রবীন্দ্রনাথের মতামতের ধরন। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিশীল মন এবং

সংবেদনশীলতার পরিচয় তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যে এবং কাজে স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। কিন্তু তাঁর এই সংবেদনশীল মনে যেসকল সমস্যাজনক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, একটা সময় তিনি সেইসবের সমাধানের সন্ধান করেছেন হিন্দুধর্মের সীমার মধ্যেই। এর একটি উদাহরণ মেলে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের প্রণাম করার ব্যাপারে একটি সমস্যায়।

লেখার শুরুতেই উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি, যেটিকে 'রবীন্দ্রজীবনী'কার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম কন্সটিটিউশন" বলেছেন, সেই চিঠিটি লেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষ-কে। এই কুঞ্জলাল ঘোষই সম্ভবত শান্তিনিকেতনে প্রথম অব্রাহ্মণ শিক্ষক। ঠাকুর পরিবারের মতন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যেও শিষ্টাচারের একটি অভ্যেস রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই নিয়ম করেছিলেন যে ছাত্রেরা শিক্ষক অর্থাৎ গুরুকে দেখলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শান্তিনিকেতনে প্রধান শিক্ষক তখনই কুঞ্জলাল ঘোষ শান্তিনিকেতনে আসেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য, জাতিতে কায়স্থ, কুঞ্জলাল ঘোষ শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দেওয়ার অব্যবহিত পরেই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে এই প্রণাম নিয়েই একটি প্রশ্ন জাগে এবং তিনি সেটি রবীন্দ্রনাথকে জানান। (শান্তিনিকেতনে একে অপরকে নমস্কার করবার রীতির হয়তো এটাই সূত্রপাত)। যার উত্তরে ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ (অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর, ১৯০২) তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখে জানান– "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবেনা। সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়। সর্বাপেক্ষা ভাল হয় যদি কুঞ্জবাবুকে নিয়মিত অধ্যাপনার কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তিনি যদি আহারাদির তত্ত্বাবধানেই বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকেন তবে ছাত্রদের সহিত তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকে না।" ঠিক এর পরের বাক্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন– "ব্রাহ্মণেতর ছাত্রেরা কি অব্রাহ্মণ গুরুর পাদস্পর্শ করিতে পারে না?"[10]

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে, যে সমস্যায় তাঁর সংবেদনশীল মনে প্রশ্ন উঠছে তিনি তার সমাধানের সন্ধান করেছেন হিন্দু ধর্মের সীমার অন্তর্গত থেকেই। শান্তিনিকেতনের আদি পর্বেও, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে এই ধরনটির অন্যথা হয়নি। তাই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পঙ্‌ক্তিতে খাওয়ার ব্যবস্থারও দীর্ঘদিন কোন পরিবর্তন হয়নি। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন বলছেন "আহারের ঘরে একবার কিছুদিন গুরুদেব সকলের সঙ্গে খেতেন", তখন ব্যক্তিগত কোন কারণে নাকি নিঃশব্দে নিজের মতটি অন্যদের জানানো এবং তার দ্বারা প্রভাবিত করবার জন্য পরিকল্পনা করেই, ঠিক কি কারণে রবীন্দ্রনাথ সেইবার সকলের সঙ্গে খেতেন সেকথা না জানা থাকলেও, একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই ব্যবস্থার কোন অন্যথা তখনও হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে এই বিষয়ের উপর প্রথম প্রশ্ন আসে ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধীর আসার পরে। গান্ধীজি শান্তিনিকেতনের দু'টি ব্যাপারে খুশি হ'তে পারেননি। একটি হ'ল আশ্রমের নানা কাজ, যেমন রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির জন্য কর্মচারী রাখার ব্যবস্থা। তাঁর মত হ'ল আশ্রমের কাজ আশ্রমের ছাত্র-শিক্ষকেরাই করবেন। এই উদ্যোগ প্রায় মাস দেড়-দুই শান্তিনিকেতনে চলেছিল। এই উদ্যোগের স্মৃতিতেই এখনো শান্তিনিকেতনে প্রতি বছর ১০ মার্চ 'গান্ধী-পুণ্যাহ' পালিত হয় যেদিন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরই আশ্রম পরিষ্কার করা সেখানে রীতি।

গান্ধীজির দ্বিতীয় আপত্তিটি ছিল খাওয়ার ঘরে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পঙ্‌ক্তি ভোজন নিয়ে। "রবীন্দ্রজীবনী"কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন– "শান্তিনিকেতনের পাকশালায় ও ভোজনগৃহে তখন পর্যন্ত হিন্দুসমাজের জাতিবিচার মানিয়া চলা হইত। কবির সহিত কথাবার্তায় এই আলোচনাটি ওঠে। গান্ধীজি বলেন যে তাঁহার মতে আশ্রমে সকলে সমানভাবে থাকিবে, আহারে বিহারে অশনে আসনে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকা উচিত নহে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা পৃথক পংক্তিতে ভোজন করিত, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা এবিষয়ে ছাত্রদের কখনো কোনো উপদেশ দিতেন না, ছাত্রেরা নিজ নিজ অভিভাবকের নির্দেশানুসারে পংক্তিবিচার করিত। গান্ধীজি বলিলেন, এভাবে পৃথক পংক্তি ভোজন করা আশ্রমধর্ম-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলেন যে, তিনি কোনোদিন ছাত্রদের ধর্ম বা সমাজবিষয়ক মত সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ করেন নাই। জোর করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাহারা নিয়ম পালন করিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা তাহাদের অন্তরে গাঁথা হইয়া যাইবে না। যে-জিনিস অন্তর হইতে গৃহীত হয় না, তাহা বাহিরের চাপে স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। সেইজন্য তিনি বাহির হইতে নৈতিক চাপের পক্ষপাতী নহেন।"[11]

এই ঘটনা এবং পরস্পরের এই মতের কথা উল্লেখ ক'রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন" শীর্ষক অন্য একটি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন– "গান্ধীজীর মতে এটা নিস্ক্রিয়তার লক্ষণ।" তিনি যেটা ঠিক মনে করতেন তার জন্য "গান্ধীজী দুঃখ পেতে বা দুঃখ দিতে দ্বিধা করতেন না।... রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দুঃখ পেতেন, কিন্তু তার জন্য অন্যকে দুঃখ দিতে পারতেন না। কর্মী ও কবির মধ্যে এইখানে মস্ত একটা ভেদ।"[12]

বলা বাহুল্য ঔচিত্যের প্রশ্নে তিনি যা মনে করতেন তার জন্য দুঃখ এবং দিতে গান্ধীজি সত্যিই পিছপা হতেন না। এর নিদর্শন তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় আছে। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে তিনি যখন ওকালতি করছেন, তখন এক অস্পৃশ্য জাতিতে জন্ম খ্রিস্টান করণিকের ব্যবহৃত বাথরুম পরিষ্কার করা নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে তিনিতাঁর স্ত্রী কস্তরবাকে পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের ক'রে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।[13] কিন্তু সে যাই হোক, আশ্রমের সব কাজ ছাত্র-শিক্ষকেরা নিজেরা করবেন– এই নীতি যখন শুরু হ'ল, চাকরদের বিদায় ক'রে ছাত্র-শিক্ষকেরাই কায়িক শ্রমও করতে আরম্ভ করলেন, সেইসময়ের প্রসঙ্গে

শান্তিনিকেতনের তৎ কালীন ছাত্র সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন– "সে-সময়ে আশ্রমে ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্ররা 'জাত' রক্ষা করে আলাদা পঙ্‌ক্তিতে ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না খেতেন– অব্রাহ্মণ কোনও খাদ্য স্পর্শ করত না। যখন স্বাবলম্বন প্রথা শুরু হ'ল তখন রান্নাঘরে যেসব শিক্ষক ছাত্র 'জাত' মানতেন না তাঁরা রান্না করতে লেগে গেলেন– সুতরাং যেসব ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্র আলাদা ব্রাহ্মণের রান্না খেতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের জন্যে হরিবাবু ও শাস্ত্রীমশাই যে আলাদা বাড়িতে থাকতেন তারই একটা ঘরে রান্না হতে লাগল। খুব সম্ভব সেখানে ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত থাকল– ঠিক মনে নেই। শাস্ত্রীমশাই চিরদিন স্বপাক আহারে অভ্যস্ত, তাঁর সম্বন্ধে এই স্বাবলম্বন নীতির কোনও প্রশ্নই ছিল না। ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও ছাত্রদের আলাদা রান্না খাওয়া নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনা এমন কি মতদ্বৈধ হয়, সে কথা তখন টের পাইনি। 'রবীন্দ্রজীবনী' পাঠে এখন জানতে পারি।"[14]

অতএব বোঝা যাচ্ছে স্বাবলম্বন নীতি যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন এই ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পঙ্‌ক্তিতে খাওয়ার ব্যবস্থা উঠে গিয়েছিল। কিন্তু তা একেবারে উঠে যায়নি। মাস দেড়-দুই পরে যখন গান্ধীজির এই স্বাবলম্বন নীতি উঠে গেল তখন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পঙ্‌ক্তির ব্যবস্থাও আগের মতন ফিরে এসেছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন– "মহাত্মা গান্ধী যখন পাকশালায় ঠাকুর চাকরের প্রচলন রহিত করিয়া সর্ববর্ণসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে অনুপস্থিত।[15] এইরূপ আকস্মিক আচারবিপ্লবে বিশৃঙ্খলার বিষম আঘাতে আশ্রমের চির-প্রচলিত নিয়ম ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, উদ্বেগ-অশান্তিতে সকলেরই মনও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। এই নিয়ম কিছুদিন চলিলে, কবি আশ্রমে আসিয়া গোল মিটাইয়া পুনর্বার পূর্ব নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।"[16]

তাহলে প্রশ্ন ওঠে কবে থেকে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি উঠে গেল? শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯১৭ সালে এগারো-বারো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনিও জানাচ্ছেন– "...একদিন এখানের এই মাটিতে এক বৃহৎ ব্রাহ্মণ-পঙ্‌ক্তিতে ব্রাহ্মণ শিশুগণ আহারে বসতো, তাঁদের প্রথমে পরিবেশন করে তবে ব্রাহ্মণ পাচকগণ, ব্রাহ্মণেতর জাতির পঙ্‌ক্তিতে অন্ন বিতরণ করত।"[17]

কিন্তু কবে এটা উঠে গেল সেই সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তারিখ না বলে তিনি লিখছেন– "গ্রাম থেকে এসেছিলাম। জাতিতে ব্রাহ্মণ। কখনো অব্রাহ্মণের হাতে অন্ন গ্রহণ করিনি। কিন্তু তার জন্য কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। পাকশালায় ব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তি ছিল পৃথক। ব্রাহ্মণেরাই তাতে পরিবেশন করতেন। অবশ্য কোনো ব্রাহ্মণ যদি অন্য পঙ্‌ক্তিতে বসতে চাইতেন, তাতে আপত্তি ছিল না। দীর্ঘকাল ভোজনগৃহে এক দীর্ঘ ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বলেননি– 'এখানে ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি রাখা চলবে না, একে উঠিয়ে দিতে হবে।' কিন্তু একদিন সেই ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি নিজের থেকেই উঠে গেল। কেমন করে গেল, কবে গেল কারো লক্ষ্য হয়নি। দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি হ্রস্ব হতে হতে একদিন একেবারেই অস্তিত্ব হারাল।

জোর জবরদস্তির কোন প্রয়োজন হয়নি।"[18]

অতএব উঠে যাচ্ছে এই কথা জানা গেলেও নির্দিষ্ট কোন তারিখ সুজিতকুমারের লেখা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। "রবীন্দ্রজীবনী"কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ কলকাতা অধিবেশনে, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করা হ'লে, গান্ধীজি ১৩ সেপ্টেম্বর বিশ্রামের জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন। এইসময়েই "খিলাফত প্রচার ব্যপদেশেই সৌকত আলীর বাংলাদেশে আগমন। গান্ধীজি আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিহাসে এটি স্মরণীয় ঘটনা। এখানে এতকাল মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অন্ধ গোঁড়ামি কর্মীদের মধ্যে, তাহা আজ রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য স্বয়ং সৌকত আলীকে সাধারণ ভোজনাগারে লইয়া আহারস্থানে বসাইলেন। অথচ কয়েক বৎসর পূর্বে যখন একটি মুসলমান বালক ছাত্ররূপে আসিবার প্রার্থী হয় তখন তাহাকে কোথায় কিভাবে আহার করিতে দেওয়া যাইবে, তাহা লইয়া অনেকের কি দুর্ভাবনা দেখা দিয়াছিল!"

এই ঘটনার তিন মাস পরেই, ৮ ডিসেম্বর-১৯২০, এন্‌ড্রুজ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় চিঠি লিখে জানাচ্ছেন "So now in the kitchen we have no Brahmin lines, for no one cares a pin about it, at last."[19] অতএব মোটামুটি ধরা যেতে পারে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায়, সেই সময়কালেই, ১৯০১-এর ডিসেম্বর মাস থেকে দীর্ঘ উনিশ বছর পরে ১৯২০-র ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আলাদা পঙ্‌ক্তিতে খাওয়া বন্ধ হয়। শান্তিনিকেতনের অন্যতম পরিচিত শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০৮ সালে। তিনি "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "আশ্রমে আসিয়া দেখি এখানকার চাকর অনেকেই তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি। আশ্রমের দুই-চার জন 'নিষ্ঠাবান' লোক ছাড়া আর সবাই তাহাদের হাতে শুধু জল কেন, অন্নও খান। বলা বাহুল্য, এই ঘটনা অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বের এবং ইহার কোনো রাজনৈতিক হেতু থাকিবার কথা ছিল না।"[20]

এই কথাটি মনে হয় সর্বাংশে ঠিক নয়। একথা ঠিক যে অনেকেই হয়তো সেইসময় ছিলেন, যাঁরা এই জাতিবিচার করতেন না এবং সেই না করার মধ্যে প্রকট কোন রাজনৈতিক হেতু ছিল না (বরং বাংলার ভক্তি আন্দোলন ও নবজাগরণ-এর প্রভাব সেখানে থাকতে পারে)। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন "দুই-চার জন 'নিষ্ঠাবান' লোক ছাড়া আর সবাই তাহাদের হাতে শুধু জল কেন, অন্নও খান"– এই কথা বলে বিষয়টি যতটা লঘু দেখিয়েছেন আদতে ঘটনাটি মোটেই ততটা লঘু যে ছিল না, উপরের তথ্যগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয়। এছাড়াও উপরে উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-এর আলাদা পঙ্‌ক্তির অবসানের খবর সংবলিত ৮ ডিসেম্বর-১৯২০ তারিখে "এন্‌ড্রুজ কবিকে আশ্রমের রন্ধনশালা ও ভোজনাগার সম্বন্ধে যে পত্র দেন,

তাহা হইতে জানিতে পারি যে গুজরাটি ছাত্রদের জন্য পৃথক ভোজনাগারে ছাত্ররা তাহাদের 'জাত' রক্ষা করিয়া পৃথক পৃথক দলে বসিতেছে; সে ঘরে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। তবে তিনি আশাবাদী— আশা করেন এ সব বাধা দূর হইবে।"[21]

তাই ক্ষিতিমোহন সেন যেভাবেই বলুন না কেন, যারা জাতিভেদে বিশ্বাস করে তাদের সেই বিশ্বাস মানার বা অনুশীলন করবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে কোন অ-বন্দোবস্ত ছিল না তা অনস্বীকার্য। আবার কেবলমাত্র যে 'রাজনৈতিক হেতু'র ফলেই যে এই ব্যবস্থা উঠে গিয়েছিল একথাও ঠিক নয়। এই ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার প্রক্রিয়া যে নানা ভাবে আগে থেকেই ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়েছিল উপরের তথ্যগুলি থেকে সেই কথাও বোঝা যায়। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবস্থাটির অবসানের একটি তারিখ হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক উপলক্ষ্যকে ধরাটাই মনে হয় সঠিক।

কিন্তু স্পষ্টভাবে ভিতর থেকে না হয়ে রাজনৈতিক উপলক্ষ্যকেই কেন্দ্র ক'রে শান্তিনিকেতনে কোন জিনিস হওয়া রবীন্দ্রনাথের মনে হয় বাঞ্ছিত ছিল না। শান্তিনিকেতন থেকে অসহযোগ আন্দোলনের উপলক্ষ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উঠে যাওয়ার প্রসঙ্গে এ'কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ৫ মে ১৯২১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ "শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও সমসাময়িক শিক্ষক সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন; 'ম্যাট্রিক আমার মনের মতো জিনিস নয়— কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক যখন এটা চায় তখন ছেলেদের জোর করে ম্যাট্রিক থেকে ছিন্ন করে আশ্রম থেকে বহিষ্কৃত করতে আমি এ পর্যন্ত পারিনি।... এ সমস্ত সত্ত্বেও ম্যাট্রিক উঠে যাওয়াটা আমি তত ক্ষতিকর মনে করিনে-কারণ ওটা ভূতের মতোই আমাদের বিদ্যালয়ের ঘাড়ে চেপেছিল— গেছে আপদ গেছে। কিন্তু আমার আপত্তি এই যে, বিদ্যালয়ের নিজের ভিতরের দিক থেকে এই সংস্কার হল না, এটা হল নন-কো কো-অপারেশন পর্বের একটা অধ্যায় রূপে। বাহির থেকে পলিটিক্সের ঝাঁটা আমাদের শান্তিনিকেতনের পিঠের উপর পড়ল। তাতে করে পিঠের যদি কোনো ময়লা উঠে গিয়ে থাকে সেই সঙ্গে অনেকখানি চামড়াও উঠে গিয়েছে— তার ব্যথ্যা এবং তার দাগ সহজে মিটবে না।' "[22]

ম্যাট্রিক যদিও শান্তিনিকেতনে অব্যবহিত পরেই আবার ফিরে এসেছিল, কিন্তু পলিটিক্স হোক বা যাই হোক, বাইরে থেকে অনেক সময় কোন প্রভাব না আসলে ভিতরের স্থবিরতা আন্দোলিত হয় কি? এই আলোচনা স্বতন্ত্র। আপাতত সেটি মুলতুবি রেখে এখানে শুধু এ'কথার উল্লেখ করা যায় যে জাতপাত বা "অকল্যাণকর" সংস্কার দূরীকরণে, বাইরের কোন প্রকট প্রভাবে নয়, বরং শান্তিনিকেতনের ভিতরে আপনা থেকেই তৈরি হয়েছিল একটি 'সংস্কার-সমিতি'। এইবার সেই গল্প।

২

ইতিমধ্যে "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠা হওয়ায় (১৯১৮-র ডিসেম্বরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ১৯১৯-এর জুলাইয়ে পঠন-পাঠন শুরু, ১৯২১-এর ডিসেম্বরে বড় অনুষ্ঠান ক'রে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-এর সভাপতিত্বে সর্বসাধারণের হাতে উৎসর্গ)[23] পরে "তাতে বিদ্যার্থী হয়ে এলেন সুদূর সিলেট থেকে সৈয়দ মুজতবা আলি, আর এলেন আরও সুদূর লাহোর থেকে জিয়াউদ্দীন, নাগপুর থেকে এলেন খ্রিস্টান বিনায়ক মাসোজি।"[24] ১৯০৮ থেকে ১৯১০ দুই বছর চলবার পরে বন্ধ হয়ে গেলেও, ১৯২২ সাল থেকে শুরু হ'ল মেয়েদের পড়াশোনাও।[25] ১৯০১ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে কেবল মোহিতচন্দ্র সেন-এর দায়িত্বকালের কিছু সময় আমিষ খাওয়া চললেও, ১৯০৫ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত একটানা ছিল নিরামিষ আহার।[26] ১৯১৮-তে অবসান হ'ল সেই ব্যবস্থার। ১৯১৮ সালেই শান্তিনিকেতনে এল বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও।[27] এইরকম পরিবেশে ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন তরুণ "সংস্কার-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সংস্কৃত, বাংলা ইত্যাদি একাধিক ভাষায় তাঁরা তাঁদের আহ্বানবাণীতে প্রচার করেন– "সর্বপ্রকার অকল্যাণকর সংস্কার ছিন্ন করিয়া এবং সর্বশাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া, এই শ্রেয়সী 'সংস্কার সমিতি' যুক্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। নিজযুক্তির বিরোধী হইলে এই 'সংস্কার সমিতি' সকলের এমন কি পরব্রহ্মের অনুশাসনও (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র) অগ্রাহ্য করে। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও ইসলামধর্মী সকলকেই এই 'সংস্কার সমিতি' আহ্বান করিতেছে। ইহাতে সকলের অধিকার আছে। সংস্কারের দ্বারা আবিল বুদ্ধি মলিন দর্পণের ন্যায়। সেই বুদ্ধিকে বিমল করিলে তাহাতে আলোক প্রকাশিত হয়।"[28] ঠিক হয়, যাঁরা এই সমিতির 'আজীবন সভ্য' হবেন তাঁদের একটি করে কঠিন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। যথা– হিন্দুকে 'গোমাংস', মুসলিমকে শূকরের মাংস খেতে হবে। খ্রিস্টানকে কি খাওয়ানো যায়, বাদুড়, কাঠবেড়ালি নাকি ইঁদুর তা নিয়ে বিচার-বিমর্শ করা হলেও যেহেতু খ্রিস্টান কেউ তখন সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী ছিলেন না, তাই এই বিষয়ক সিদ্ধান্ত তখনকার মতন মুলতুবি রাখা হয়। এহেন অগ্নিপরীক্ষার মানদণ্ডের কারণে অনেকেই তখন সমিতি ত্যাগ করেন। মুসলিম কেবলমাত্র একটি ছাত্র সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন মাদ্রাজের নিরামিষাশী মুসলমান। তাঁকে তখনকার মতন যে কোন একটি মাংস খেলেই সভ্য করা হবে বলা হলেও, তিনিও গররাজী হয়ে সমিতি ত্যাগ করেন।

সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী এমন অনেকে তখন ছিলেন যাঁরা সমিতির আদর্শ নিয়ে অনেক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ার কথা শুনে তাঁদের অনেকেই এভাবে সরে যাওয়াতে, এইসকল উৎসাহী মানুষদের সমিতি যাতে একেবারে না হারায় তার জন্য তখন সমিতিতে তিন ধরনের পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথম পদ হ'ল 'মহাচূড়ন্ত', এঁরা সমিতির আজীবন সভ্য। দ্বিতীয় পদ 'চূড়ান্ত'– এঁরা হলেন সাধারণ সভ্য। আর তৃতীয় পদটি হ'ল

'উড়ন্ত', এঁরা একদম চূড়ান্তভাবে সমিতিতে যোগ দিতে পারেননি, মন তাদের তখনো উড়ু, উড়ু করছে। অনেকেই প্রস্তাব করেন চতুর্থ আর একটি পদ তৈরির জন্য, যেটির না হবে— 'পুড়ন্ত', অর্থাৎ যাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে অনুতাপানলে পুড়ছেন এবং এরপরে সমিতিতে যোগ দেবেন। কিন্তু সমিতির নেতৃত্ব জানান— "কে কে পুড়ছেন, তা যাঁরা পুড়ছেন, তাঁরাই জানেন। আমাদের জানবার কথা নয়। কেননা, আমরা এখনও অন্তর্যামী হতে পারি নাই।" তাই চতুর্থ পদটি আর তৈরি হয়নি। তবে সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা এবং 'মহাচূড়ন্ত' পদাধিকারী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন— "পুড়ন্ত সভ্য" তাঁদের "সমিতির অন্তর্ভুক্ত না হলেও" তাঁদের "আলোচনার বহির্ভূত ছিলেন না।" তাঁরা "প্রায়ই কারো কারো সম্বন্ধে ঐ সংজ্ঞা প্রয়োগ" ক'রে থাকতেন।[20] কিন্তু মুশকিল হ'ল বোলপুরের বাজারে তখন 'গোমাংস' পাওয়া যেত না। অগত্যা সমিতির সদস্যেরা ঠিক করেন খাঁসির মাংসকেই বড় বড় টুকরো ক'রে কেটে তাঁরা 'গোমাংস' বলে চালাবেন। সেই মত বড় বড় মাংসের টুকরোতে হলুদ মাখিয়ে তাঁরা সেগুলি বাছুরের মাংস বলে— রান্না ক'রে খেয়ে চতুর্দিকে প্রচার চালালেন। স্বাভাবিকভাবেই শান্তিনিকেতনে চাঞ্চল্যও তৈরি হ'ল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সাময়িক চাঞ্চল্য তৈরি হলেও এই নিয়ে তেমন কোন বিশেষ সমস্যারই সৃষ্টি হয়নি। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন— "... একজন উৎসাহী আদর্শবাদী শিক্ষক তাঁর বন্ধু এক অতি পুরাতন শিক্ষকের গৃহে উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করলেন। গৃহস্বামী তখন সপরিবারে চায়ের টেবিলে। উত্তেজিত আগন্তুক ঝড়ের বেগে চললেন— 'আপনারা এখানে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চা খাচ্ছেন— এদিকে যে আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র 'বিফ' '(Beef) খেয়েছে— খবর রাখেন?'

বাড়ীর গৃহিণী শুনলেন 'বিষ খেয়েছে!' তিনি অধিকতর উত্তেজিত হয়ে বললেন 'বিষ খেয়েছে তো আপনি এখানে কিজন্যে এসেছেন? যান যান, দেখুন গিয়ে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কিনা— এবং চিকিৎসা হচ্ছে কিনা!'

আগন্তুক বললেন 'আরে না না! বিষ নয়— বি— ফ '(Beef)'।

ভদ্রলোক বললেন— 'বাঁচা গেল! যা ভয় পেয়েছিলাম। তাই বলুন বিষ নয় 'বিষ'। ...আরে 'বিফ' খেয়েছে তো কি হয়েছে?' "

মনে হয় বোলপুরে 'গোমাংস' পাওয়াই যায় না এই খবর শিক্ষকেরা আবিষ্কার করাতে চাঞ্চল্যের তীব্রতা আর তেমন কিছু হয়নি। এদিকে প্রথম একটি সংস্কার-এর উপর সাফল্যের সঙ্গে আঘাত হেনে, সংস্কার সমিতি উপনীত হলেন তাঁদের দ্বিতীয় কর্মসূচিতে।

সমিতির নেতৃত্ব ঠিক করলেন, "স্মৃতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ দুটি 'গর্হিত' কাজ তাঁরা একসঙ্গে করবেন। কাজ দুটি হলো— চণ্ডালের অন্নগ্রহণ এবং গ্রাম্য-শূকরের মাংস ভক্ষণ।" কিন্তু দুঃখের কথা "স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত 'চণ্ডালকে' খুঁজে পাওয়া গেল না। হাতের কাছে পাওয়া গেল— তাঁদের চিরপরিচিত রসিক মেথরকে। তাকেই তখনকার মতো চণ্ডালের পদগৌরব দিয়ে অনুরোধ করা হলো— তার সহধর্মিণীর রান্না করা শূকর মাংস যেন সমিতির সভ্যগণকে সেরখানেক

দেওয়া হয়। মাংসের দাম এবং তেল, ঘি, মসলার খরচ তাঁরা দেবেন। রসিক বুদ্ধিমান। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র। সংস্কার-সমিতির আদর্শের কথা সে তার নিজের মতো করে একপ্রকার বুঝেছিল। তাই এই পবিত্র সাধন-কার্যে পয়সা নিতে তার ঘোর আপত্তি। সমিতির সভ্যেরাও নাছোড়বান্দা। অবশেষে রসিক যা যুক্তি দিল, তাতে দাম দেওয়া বা খরচ দেওয়ার কথা আর তোলাই গেল না। রসিক বলল— শূকর তার নিজের ঘরের। জীবনে কোনোদিন সে শূকর কেনেনি। তার ঠাকুরদাদার বাবা যা কিনে রেখে গেছলো— তাতেই তারা তিন পুরুষ বিনি পয়সায় মাংস খেয়ে আসছে। আর মাংসে তেল, ঘি বা মসলা, তারা কোনোকালেই দেয় না। এক নুন দেয়। তা, তার আর কি বা দাম।" সংস্কার সমিতির হিতাকাঙ্ক্ষী রসিক-এর দেওয়া সেই শূকরের মাংস সমিতির সকল 'মহাচূড়ান্ত' এবং দুইজন 'চূড়ান্ত'-- সকলে মিলে খেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন মন্দির থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে, তেজেশচন্দ্র সেন-এর নিবাস, "তালধ্বজ" কুটীরে বসে। আনন্দের কথা স্মৃতিশাস্ত্রের এরকম বিরুদ্ধাচারণ করা সত্ত্বেও সংস্কার-সমিতিকে এবারেও তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হ'ল না। কিন্তু 'মহাচূড়ান্ত' সুজিতকুমার জানাচ্ছেন— "শূকর মাংস যে এত গুরুপাক— তা চূড়ান্ত, মহাচূড়ান্ত কোনো সভ্যেরই জানা ছিল না। ইতিহাসে তাঁরা পড়েছিলেন বটে, বৃদ্ধবয়সে শূকর মাংস ভক্ষণ করে বুদ্ধদেব মারাত্মক অসুখে পড়েন। যৌবনেই সুস্থ, সবল সভ্যদের যা অবস্থা হলো, তাতে বৃদ্ধবয়সে কী হতে পারে— কল্পনা করতে অসুবিধা হলো না।... প্রৌঢ় তালধ্বজ মশায়কে মাত্র একটুকরো মাংস 'চাখতে' দেওয়া হয়েছিল – তাতেই তাঁর একদিনের রান্নার পরিশ্রম এবং খরচ বেঁচে যায়।" কিন্তু সে যাই হোক, এইভাবেই "বিরুদ্ধ দলের বাধাদানকে... তোয়াক্কা" না করে ইয়ং বেঙ্গলোচিত উপায়ে "একটার পর একটা সংস্কারে আঘাত দিতে দিতে, সংস্কার-সমিতির সভ্যগণ স্বচ্ছন্দে অগ্রসর" হচ্ছিলেন।

"এমন সময় এলো ১৯৩২" খ্রিস্টাব্দ। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের "কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড"। অবদমিত জাতিদের জন্যেও "সেপারেট ইলেক্টোরেট"। যার প্রতিবাদে অন্তরীণ গান্ধীজি পুণা জেলেই বসলেন অনশনে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতেই আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধীজির সেই বিখ্যাত "পুণা প্যাক্ট"। দেশময় সেই উত্তেজনার পরিস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রীরাও মনে করেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তাঁদেরও কিছু করা প্রয়োজন। ঠিক হয়, আশেপাশের গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ করে, সমবেত এক সভায় সকলে সামাজিকভাবে তথাকথিত নীচুজাতির মানুষদের থেকে জলগ্রহণ করবেন। সেই অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর গান্ধীজির অনশনের দ্বিতীয় দিন বিকেলে আশেপাশের গ্রামবাসীদের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করা হয়। সেইদিন সিংহসদনে সকলের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ নাকি যে কথাগুলি বলেছিলেন, "দেবী বাগীশ্বরীর কণ্ঠের ন্যায় তাঁর সেই বাঙ্ময় কণ্ঠ হতেও এমন অমৃতনির্ঝর সুলভ ছিল না। সেদিন সে বাণী যে শুনেছে, সেই তার সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথরের হাতে জলগ্রহণ করেছে। আচারনিষ্ঠ বিধবাগণ পর্যন্ত, সেদিন চোখের জলের সঙ্গে

তাঁদের আজন্ম সংস্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন। গুরুদেবের সেই অভিভাষণের কিছু পূর্বে কেউ যা কল্পনাও করেনি তাই" সকলে ঘটতে দেখেছিলেন।

কিন্তু এগিয়ে থাকা সংস্কার সমিতি তাঁদের প্রগতিশীল পন্থা অনুসারে জলগ্রহণের কর্মসূচিতে সন্তুষ্ট না হয়ে, আগের রাত্রে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বরেই এক ধাপ আরো প্রগতিশীল কর্মসূচি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে জানিয়েছিলেন– "ছাত্রছাত্রীগণ কেবলমাত্র 'জলচলে' সন্তুষ্ট নন।" তখন তাঁদের কি ইচ্ছা সেই কথা রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলে তাঁরা জানান– "সাধারণ পাকশালায়– যেখানে পাচক ব্রাহ্মণগণ পাক করেন, সেখানে আগামীকাল রাত্রে মেথরেরা পাক করবে। তাদের সেই পাক করা অন্ন, তারাই পরিবেশন করবে এবং সমস্ত আশ্রমবাসী তা গ্রহণ করবে।" রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে তাতে সম্মতি দেওয়ায় সেদিনই, অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর যেদিন বিকেলে সিংহসদনে জলগ্রহণ করা হয়েছিল, ঐদিনই "রাত্রে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ এবং কর্ম্মিগুলী সপরিবারে ঐ সর্বজনীন ভোজে যোগ দিলেন। মেথরগণ তাঁদের স্বহস্তে পক্ক অন্ন (খিচুড়ি) সকলকে পরিবেশন করল।" প্রত্যক্ষদর্শী সুজিতকুমারের পর্যবেক্ষণ "শান্তিনিকেতনেও এ খুব সহজে হয় নাই। যাঁরা সর্বজাতির অন্নগ্রহণে অভ্যস্ত তাঁরাও মেথরের অন্নগ্রহণে রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন।" তবু ২১ সেপ্টেম্বরের বিকেল এবং রাত্রি-র দু'টি কর্মসূচিই যে সফল হয়েছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। সমস্যা এলো পরের দিন। পাকশালা অর্থাৎ রান্নাঘরের ব্রাহ্মণ পাচকেরা সকলেই পরের দিন কাজে যোগ দিলেও তথাকথিত নীচু জাতির কর্মচারীরা আর কাজে এলেন না। সুজিতকুমার জানাচ্ছেন– "নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে তাদের বাস। সেখানে আমরা বহু সাধ্যসাধনা করলাম। কিন্তু তারা অটল। মেথরেরা যে বাসন ছুঁয়েছে– সে বাসন কেবল সেদিন নয়, কোনদিনই তারা (হাড়ি, ডোম, বাউরি, মুচিরা) মাজবে না। শুধু তাই নয়, ঐ পাকশালাতেই তারা আর ঢুকবে না। কর্তৃপক্ষ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তরুণদের নেতারা বিন্দুমাত্র ভয় পেলো না। তারা বলল– "আমরাই বাসন মাজব। শুধু একদিন নয়– দিনের পর দিন।" তাদের সেই অটল প্রতিজ্ঞায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণা দেখা গেল। হাসিমুখে দিনের পর দিন তারা ঐ বিরাট পাকশালার, বৃহদাকার হাঁড়ি, ডেকচি, কড়াই প্রভৃতি দুবেলা মেজে যেতে লাগলো। কিন্তু বেশিদিন তা করতে হলো না। ঝি-চাকরেরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ঐ পাকশালা তাদের জীবিকার উৎস। সমস্ত পরিবার পোষণ হয় ওখানকার অন্নে। কদিন তারা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে? তাছাড়া, তাদের আশঙ্কা হলো- অন্য জায়গা থেকে লোক আসবে। একে একে, সকলেই এসে তাদের কাজে যোগ দিল।"

এই সময়েই, অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং তথাকথিত নীচুজাতির মানুষদের উন্নয়ন-এর জন্য কি করা যেতে পারে সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মী এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের তাঁর 'উদয়ন' বাড়িতে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। ঠিক হয় একটি সমিতি কাজ পরিচালনা করবে। এই সমিতির নাম কি হবে তা নিয়ে আলোচনা হ'লে

ঠিক হয়, ১৯২৬ সালে তৈরি 'সংস্কার সমিতি' তার আগের সংগঠন তুলে দিয়ে ঐ নামেই নতুন আঙ্গিকে পুনর্জন্ম লাভ ক'রে এই কাজ করবে এবং অন্য সকলেও সেই সমিতিতে যোগ দেবে। সমিতির "পৃষ্ঠপোষক (patron)" হবেন– স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সমিতি তৈরি হয়ে গেলে, সমিতির তৎকালীন সম্পাদক সুজিতকুমার জানাচ্ছেন "সংস্কারসমিতির... নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীগণ দলে দলে গ্রামে গ্রামে অস্পৃশ্যতাবর্জন ও হরিজন উন্নয়নের কার্যে আত্মনিয়োগ করল। বিদ্যালয়ের ছুটির পর, বিকেলে তারা খেলাধূলা ছেড়ে, অতি উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করে যেতো। তখন তাদের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা এসেছিল।"[30]

নবপর্যায়ের "এই সংস্কারসমিতি পরে শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত" হয় এবং ১৯৩৩-'৩৪ সালে শান্তিনিকেতনে 'সংস্কার ভবন'-এ রূপান্তরিত হয়। এই 'সংস্কার ভবন' ছিল শান্তিনিকেতনের 'তিনপাহাড়' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দেহলী' বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায়।[31] শান্তিনিকেতনে "আহার্য, বাসস্থান ও বেতন সেকালে স্কুলের ছাত্রেরও মাসিক ব্যয় ছিল পঁচিশ টাকা। কোনো দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় সম্ভব ছিল না।"[32] তাই পিছিয়ে পড়া জাতির কারোর সেখানে পড়াশোনার সুযোগও ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এই সকল দুঃস্থ, পিছিয়ে পড়া জাতির ছাত্রদের জন্য "সংস্কার ভবনে' মাত্র ছয় টাকায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। বাড়ি হতে চাল আনতে পারলে নগদ টাকা অতি সামান্যই প্রয়োজন হতো।" মূলত দুঃস্থ, পিছিয়ে পড়া জাতির ছাত্রদের জন্য হলেও "অন্যদেরও ঐ আহার্য গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না। 'সংস্কার ভবনে'র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পরিচালক শ্রীসুধীরচন্দ্র কর... বোলপুর বাজার হতে তরিতরকারী প্রভৃতি ক্রয় করে এনে শান্তিনিকেতনে সামান্য লাভে তা বিক্রয় করে" গরীব ছাত্রদের সেবায় তা ব্যয় করতেন। ১৯৪০ সালে এই 'সংস্কার-ভবন' ভেঙে পড়ে। ১৯২৬ সালে যে 'সংস্কার-সমিতি' তৈরি হয়েছিল, ১৯৩২ সালে নবকলেবর লাভ করেছিল এবং ১৯৩৩-'৩৪ সালে রূপান্তরিত হয়েছিল 'সংস্কার-ভবন'-এ, ১৯৪০-এ সেই 'সংস্কার-ভবন'-এর ভেঙে পড়ার মধ্যে দিয়েই মনে হয় এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সুজিতকুমার বলেছেন– "সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হয়, প্রাক্তন ও নতুন, ঐ সংস্কার-সমিতির চেয়ে 'সংস্কার-ভবন' অধিকতর সংগঠনমূলক কাজ করে।"

১৯৩২ সালে গান্ধীজির অনশন চলাকালীন, ২৪ সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথের আর একটি গল্প দিয়ে এই লেখা শেষ করবো।

গান্ধীজির এই অনশনের কিছুদিন আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে "কালের যাত্রা" নাটকের মহড়া চলছিল। প্রমথনাথ বিশীর মূল ভাবনার এই নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ একটি অনন্য রূপ দেন। মূল বিষয়– রথ টানা হচ্ছে কিন্তু রথ এগোচ্ছে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য– সকল উচ্চ বর্ণের সর্বশক্তির প্রয়োগেও রথ এগোল না। "অবশেষে যখন সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অবজ্ঞাত নিপীড়িতের দল এসে রথের রশি ধরল– তখন রথ চলল।"

কিন্তু এসময় গান্ধীজির অনশন আরম্ভ হওয়ায়, "তরুণ অধ্যাপকদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন 'এই সময় নাটক অভিনয় করা বা তার রিহার্সেল দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?' " এরকম সময়েই ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠান। সুজিতকুমার জানাচ্ছেন– "...সেদিন যা দেখলাম– তা সারাজীবনে আর কখনো দেখিনি। তাঁর সুগৌর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। চক্ষু ভ্রূকুটি-পূর্ণ। শরীর কম্পমান।" "...বজ্রনির্ঘোষের ন্যায়" রবীন্দ্রনাথ তখন সুজিতকুমারকে বলেন– " 'মহাত্মাজীর উপবাসে আমি অভিনয় করছি, তাঁর বেদনা আমাকে স্পর্শ করেনি– করেছে তোমাদের কলেজের ঐ তরুণ অধ্যাপকদের।
"এ নাটকটা কী– তারা কি তা বোঝে না!
এই নাটকের রিহার্সেলে যারা দোষ দেখে– রতনকুটিরে সন্ধ্যেবেলায় তাদের প্রতিদিনের 'ব্রিজ খেলা' কি বন্ধ হয়েছে?" তারপর একটি কাগজ তিনি সুজিতকুমারের হাতে দিয়ে বলেন– "যাও। নিয়ে যাও। তোমাদের ঐ অধ্যাপকদের কাছে। এই 'প্রতিজ্ঞাপত্রে' সই করার সাহস তাঁদের আছে কি?' "

সেদিন বিকেলেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে পুণা রওনা দেন। সেইবারেই গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি গাইতে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সুর ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু এই 'প্রতিজ্ঞাপত্রে', যেটি তিনি স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য সুজিতকুমারকে দিয়ে যান, তার বয়ানটি তিনি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল– "এতকাল হিন্দুসমাজে যাহারা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া গণ্য, অদ্য হইতে তাহাদের সহিত পানাহারে সামাজিক বাধা স্বীকার করিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।" এই প্রতিজ্ঞাপত্রের তারিখ অতএব, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২।

তিরিশ বছর আগে ১৯০২-এর ডিসেম্বরে, 'প্রণাম' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কে লিখেছিলেন– "যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবেনা।" তিরিশ বছর পরে তিনিই লিখলেন "পানাহারে সামাজিক বাধা স্বীকার করিব না। ইহাতে সমাজে তিরস্কৃত হইলেও এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।" স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পাঠালেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের কাছে।

এর মধ্যে দিয়ে জাতিবৈষম্য নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের কোন বদল ধরা পড়ে না। তিনি নিজে যে জাতিবৈষম্য সমর্থন করতেন না, তার প্রমাণ তাঁর সারা জীবনে অসংখ্য ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে, শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তন এবং প্রতিষ্ঠানটিরও বিবর্তন।

অবশ্য ১৯০২-এ যে শান্তিনিকেতন বোলপুরের প্রান্তরে একটি বিদ্যালয় মাত্র ছিল, ১৯৩২-এ তা রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেওয়া 'বিশ্বভারতী' তে। দেশের আঙিনাতেও বিবেকানন্দ-তিলক-এর যুগ পেরিয়ে, এসেছেন গান্ধী-আম্বেদকর। তিরিশ বছর

আগের তুলনায় রবীন্দ্রনাথও স্বাধীন অধিকতর। ক্ষমতাও তাঁর অনেক বেশি। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিস্থিতি সবই বদলেছে, কিছুই নেই আর আগের মত। শান্তিনিকেতনের এই বিবর্তনও হয়তো তাই প্রভাবিত হয়েছে এই সবেরই দ্বারা।

তথ্যসূত্র :

[1] B. Animananda; *The Blade: Life and work of Brahmabandhab Upadhyay*, Roy & Son 79/25D, Lower Circular Road Calcutta; 1949; পৃষ্ঠা-- ৯৪; ব্রহ্মবান্ধব এবং রেবাচাঁদ নিজেরা এরকম প্রাচীন ভারতের আদর্শে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করেছিলেন, বা রেবাচাঁদ কেন ছেড়ে গেলেন, আরম্ভেছাত্রদের দৈনন্দিন দিনলিপি এইসবেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

[2] প্রবোধচন্দ্র সিংহ; *উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব*; প্রকাশক– অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তরপাড়া; পৃষ্ঠা– ৩০-৩৩।

[3] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ, প্রথম কার্যপ্রণালী; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; পৃষ্ঠা – ২৪, ৪১, ৪৩-৪৪।

[4] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রনাথের কথা*; সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানি; পৃষ্ঠা - ৪০-৪২

[5] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা - ৪৩

[6] উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়; আমার মাথায় তো পুলিশের টুপি নেই; আনন্দবাজার পত্রিকা; ১৯ ভাদ্র ১৪২০ বৃহস্পতিবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ – থেকে উদ্ধৃত

[7] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; ১৯৬১; পৃষ্ঠা – ৯০

[8] শিবনাথ শাস্ত্রী; *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ*; Calcutta S.K. Lahiri & CO. 554, College Street 1909; পৃষ্ঠা– ২৭৩

[9] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ*; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; ১৩৫৮; পৃষ্ঠা– ৫৬-৫৭

[10] মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, তাঁকে লেখা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি; স্মৃতি; পৃষ্ঠা– ১৪-১৫

[11] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়;*রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; আশ্বিন, ১৩৬৮; পৃষ্ঠা ৪০৮-৪০৯

[12] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন*; পুরনো লেখা- 'পুরশ্রী' পত্রিকা ২০ মে, ২০১০; পৃষ্ঠা– ৬

[13] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; আশ্বিন, ১৩৬৮; পৃষ্ঠা– ৩৩৮-৩৩৯

[14] সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়; শান্তিনিকেতনে "গান্ধী-পুণ্যাহে'র গোড়ার কথা; *পরিচয়*, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ২, ভাদ্র, ১৮৮৩, ১৩৬৮; পৃষ্ঠা– ১৩৫

[15] রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রীনিকেতনে, "সুরুলের কুঠিবাড়িতে থাকতেন। একটি নতুন নাটিকা ও গান লিখতে ব্যস্ত।.. প্রথমে তার নাম ছিল 'বসন্তোৎসব', কিন্তু পরে 'ফাল্গুনী' নামে পরিচিত।'মার্চ মাস থেকে গান্ধীজির উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে যখন স্বালম্বনের কাজ চলছে তখন রবীন্দ্রনাথ সুরুলেই থাকতেন। "খবর সব তিনি রাখতেন, শুধু নিজে দূরে রইলেন।" প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা– ১৩২ এবং ১৩৪

[16] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রনাথের কথা*; সান্যাল অ্যাণ্ড কোম্পানি; পৃষ্ঠা – ৪৩-৪৪

[17] সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবির আলোকে শান্তিনিকেতন*; কবি ও সংস্কার-সমিতি; চলতি দুনিয়া প্রকাশনী; ১৩৮৪; পৃষ্ঠা– ২১৩

[18] সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবির আলোকে শান্তিনিকেতন*; অনুপম উদারতা; চলতি দুনিয়া প্রকাশনী; ১৩৮৪; পৃষ্ঠা– ১৬৯-১৭০

[19] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; ১৯৬১; পৃষ্ঠা– ৯০

[20] ক্ষিতিমোহন সেন; "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম"; *প্রবাসী*, সচিত্র মাসিক পত্রিকা, ৩৯শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৪৬; শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; পৃষ্ঠা– ২২৬

[21] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; ১৯৬১; পৃষ্ঠা– ৯০

[22] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; ১৯৬১; পৃষ্ঠা– ৯১-৯২

[23] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী* (প্রথম খণ্ড); বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড;পৃষ্ঠা-১৯৪

[24] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের পঁচিশোত্তর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ; বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি; সম্পা.- অরুণ কুমার বসু; ১৯৯৭; পৃষ্ঠা– ৫

[25] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী* (প্রথম খণ্ড); বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড;পৃষ্ঠা– ১৯৫

[26] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা– ১৬৮

[27] প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা– ১৪৮

[28] সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবির আলোকে শান্তিনিকেতন*; কবি ও সংস্কার-সমিতি; চলতি দুনিয়া প্রকাশনী; ১৩৮৪; পৃষ্ঠা– ১৯৫-২১৩; পরবর্তী সকল তথ্য এবং উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধ থেকে গৃহীত

[29] মাত্র পাঁচজন সংস্কার-সমিতির 'মহাচূড়ান্ত' পদলাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন- প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, রামকিংকর বেইজ, পুলিনবাহারী সেন এবং সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। তথ্যসূত্র– প্রাগুক্ত।

[30] এইসময়ে "আর্যসমাজ... প্রদেশে প্রদেশে, নতুন নতুন কর্মীকে এই অস্পৃশ্যতাবর্জন কার্যে নিযুক্ত করতে" থাকেন। "বাঙলাদেশেও যাতে এর কাজ অধিকতর ব্যাপকভাবে হয়, তার জন্য আর্যসমাজ বিশ্বভারতীর নিকট কর্মী চেয়ে পাঠান।" রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে, অর্থাৎ বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় এই কাজে যোগ দেন। তথ্যসূত্র– প্রাগুক্ত।

[31] সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর; *শান্তিনিকেতন চেনা অচেনা*; মিত্র ও ঘোষ; ১৪২৮; শান্তিনিকেতনের মানচিত্র ৪৯৩ এবং পৃষ্ঠা– ২৯

[32] সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবির আলোকে শান্তিনিকেতন*; কবি ও সংস্কার-সমিতি; চলতি দুনিয়া প্রকাশনী; ১৩৮৪; পৃষ্ঠা– ১৯৫-২১৩; পরবর্তী সকল তথ্য এবং উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।



পুরোনো শান্তিনিকেতনের আশ্রম পরিবেশ